প্রথম আলো বিশেষ সংখ্যা

‘ডিজাইনড ইন বাংলাদেশ’

আফসানা ফেরদৌসি | আপডেট: ০২:৫৮, নভেম্বর ০৬, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

স্কুলে পড়ার সময় ভাবতাম আর্কিটেক্ট হব। উচ্চমাধ্যমিকের পর বাবা-মা বললেন মেডিকেল। শেষমেশ কীভাবে যেন দুটির কোনোটিই হলো না। এক বছর বিরতি দিয়ে খোঁজ পেলাম বিজিএমইএ ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির। তখন ধারণাও ছিল না, ফ্যাশনকে ডিজাইনে আনা যায় বা নেওয়া হয়। ক্লাস শুরুর কয়েক মাস পর ভার্সিটির লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা বাড়িয়ে দিলাম। ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার অভ্যাস ছিল বেশ। তাই ওখানে গিয়ে ফ্যাশন ডিজাইনের দারুণ সব বই দেখে আমার মন আটকে যায় ডিজাইনে। আগ্রহও বেড়ে যায় বই পড়ার। একই সঙ্গে ছবি আঁকার প্রতি অন্য রকম ভালো লাগা তৈরি হয়, যা আগে কখনোই হয়নি। ফ্যাশন ডিজাইনে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়ার শুরু ছিল এ রকমই।

দ্বিতীয় বর্ষের শেষের দিকে জানলাম ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন একটি ডিজাইন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে শিক্ষার্থীদের জন্য। অনেক সাহস করে প্রথম কোথাও অংশগ্রহণ করলাম। আমি ছিলাম সবচেয়ে জুনিয়র অংশগ্রহণকারী। পরে ওখানে প্রথম স্থান অর্জনের সৌভাগ্য হয় আমার। সত্যি বলতে, এই প্রতিযোগিতাই আমার ফ্যাশন ডিজাইনার হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় প্রেরণা ছিল। তখন নিজের আত্মবিশ্বাসও বেড়ে গিয়েছিল অনেক বেশি। তাই ফ্যাশন ডিজাইনপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম কথা এটিই বলব—প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আগ্রহ থাকতে হবে সব সময়। প্রতিযোগিতা নিজেকে চিনতে শেখায় এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। হেরে গেলেও প্রতিযোগিতা থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। আমার মূলমন্ত্রই ছিল প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া। চতুর্থ বর্ষে তাই আবারও নতুন এক প্রতিযোগিতায় অংশ নিলাম। সেটি ছিল বিশ্বের অন্যতম ফ্যাশন ডিজাইন প্রতিযোগিতা, যেখানে ১৬টি দেশের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। আয়োজক সোসাইটি অব ডায়ার্স অ্যান্ড কালারিস্ট, ইংল্যান্ড। এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে প্রথম হয়ে হংকংয়ে অন্যান্য দেশের চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে

অংশ নেওয়ার সুযোগ পাই এবং সারা বিশ্বে দ্বিতীয় হই। বাংলাদেশ থেকে ছিলাম আমিই প্রথম এবং এখন পর্যন্ত আমি একাই শুধু পজিশন পেয়েছি বাংলাদেশ থেকে। আর এই প্রতিযোগিতা দিয়ে আমি প্রথম বিশ্বকে জানতে শিখি। নতুন প্রজন্মের জন্য বলব, নিজেকে চার দেয়ালের ভেতরে আটকে না রেখে বিচরণের প্রয়াস রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কী ঘটছে। অংশগ্রহণ ও সফলতা শুধু নিজের আত্মবিশ্বাসই বাড়ায় না, তা কোনো সময় পথচলার নতুন গতি এনে দেয়। তার প্রমাণ রয়েছে আমার জীবনে ভার্সিটি থেকে পাওয়া প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড। এটি আমার পেশাগত জীবনকে আরও গতিময় করে দিয়েছে।

২০১১ সালে আমি সোসাইটি অব ডায়ার্স অ্যান্ড কালারিস্টের প্রতিযোগিতায় অংশ নিই। এরপর পাঁচ বছর কেটে গেল। এখন আমি বাংলাদেশের হয়ে এ প্রতিষ্ঠানটির কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করছি। এর মানে হচ্ছে, আজ আমি এখানে এসেছি, কাল আমার জায়গায় আরেকজন থাকবে। তরুণদের বলব, এখন থেকেই নিজের লক্ষ্য স্থির করতে। ফ্যাশন ডিজাইনের কিছু শিক্ষার্থীকে দেখি একটি-দুটি প্রতিযোগিতার পরেই নিজেকে হয় খুব বেশি বড় ভেবে ফেলে অথবা হতাশ হয়ে ভেঙে পড়ে। আমি স্নাতক শেষে নিজের বিশাল ফ্যাশন হাউস দিতে পেরেছি বা বড় কোনো ব্র্যান্ডের বড় পোস্টে জয়েন করেছি এমন নয়। কিন্তু আমি থেমে থাকিনি। ২০১৪ সালের মে মাসে লন্ডনের সাউথ ব্যাংক সেন্টারে আয়োজিত

‘আলকেমি’ ফ্যাশন প্রদর্শনীতে জায়গা পায় আমার ডিজাইন। সেখানে দেশকে তুলে ধরতে এবং ডিজাইনে ভিন্নতা আনতে জামদানিকে নিট ফেব্রিকে রূপান্তর করি। ১৪ দিনের এক্সিবিশনে মোট ১৬টি ডিজাইনের প্রদর্শনী হয়। এখানে ৬টি দেশের বিভিন্ন ডিজাইনার অংশ নেন। এই প্রদর্শনীর পর দেশের সংস্কৃতি সারা বিশ্বে তুলে ধরার স্পৃ হাআরও কয়েক গুণে বৃ দ্ধিপায় আমার। নতুনদের জন্যও একই কথা বলব, দেশ ও দেশের সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। এটি হতে পারে দেশ ও নিজেকে এগিয়ে নেওয়ার সবচেয়ে বড় মন্ত্র।
পরের বছর আরেকটি ভিন্নধর্মী প্রদর্শনীতে অংশ নিই বার্লিনের লোকাল ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাশন এক্সিবিশনে। সেখানে আমার ডিজাইন ছিল আপসাইক্লিংয়ের ওপরে, মানে বাতিল পোশাক নতুন করে পরিবেশবান্ধব উপায়ে পরার উপযোগী করে তোলা এবং ডিজাইনে এমন কোনো পরিবর্তন আনা, যার জন্য পোশাকটির দাম কয়েক গুণে বেড়ে যায়। আমার মনে হয় ফ্যাশনে এই ফেলে দেওয়া জিনিস নিয়ে কাজ করলে তা পরিবেশের জন্যও বন্ধুসুলভ হবে। ফ্যাশনে নীতি ঠিক রাখা জরুরি। পরিবেশ বাঁচিয়ে ফ্যাশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই সেটি হবে মূল সাফল্য। আর নতুন প্রজন্মই হোক তার ধারক ও বাহক। তাদেরই চিন্তা করতে হবে দেশীয় ফ্যাশনকে আরও পরিবেশবান্ধব করে তোলা যায় কীভাবে।

আজ আমরা বাংলাদেশ ডিজাইন কাউন্সিল থেকে চেষ্টা করছি নিজেদের দেশকে ফ্যাশনে সমৃ দ্ধকরতে। এ জন্য আন্তর্জাতিক খাদি উৎসবসহ আরও নানা আয়োজন করি আমরা। এগুলো দেশের ফ্যাশনকে নতুন পথ দেখায়। নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দেয়। নতুনদের বলব, এখন থেকেই এসব আয়োজনের খোঁজখবর রাখতে। এতে নিজেদের চিন্তার প্রসার ঘটে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখতে পাওয়া যায়।

পেশাগত দিক থেকে আমি টিম সোর্সিং নামের পোশাক রপ্তানি ও বিক্রয়কারী একটি প্রতিষ্ঠানের ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে আছি। আর এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করলে আসলে নিজের ডিজাইনের প্রতিভা খুব বেশি দেখানোর জায়গা থাকে না। কারণ আমাদের দেশের বেশির ভাগ পোশাক কারখানাই শুধু বায়ারদের দেওয়া ডিজাইন অনুযায়ী পোশাক বানিয়ে দেয়। তাই এখানে নিজেদের ডিজাইন দেখানোর সুযোগ নেই বললেই চলে। অনেক সময় দেখা যায়, বায়ার ক্রিসমাস ট্রি, জ্যামিতিক থিম থেকে মোটিফ নিয়ে ডিজাইন করতে বলে। তখন মনে হয় আমাদের দেশে এত কিছু থাকতে কেন এগুলোই করতে হবে। এই পরিবর্তন আসা জরুরি। ফ্যাক্টরি, বায়িং হাউসে অনেক ভালো ডিজাইনার আছে। তাদের সুযোগ দিলে তারাও অনেক ভালো কিছু করে দেখাতে সক্ষম। তাই আমি চাই এমন একটা পরিবর্তন আসুক যেন আগামী কয়েক বছর পর বায়াররাই বলবে, তোমাদের জামদানি মোটিফ, গামছা, লুঙ্গি মোটিফ দিয়ে ডিজাইন করে দাও। যেন মেড ইন বাংলাদেশ লেখার পাশাপাশি লেখা থাকে ডিজাইনড ইন বাংলাদেশ।

চলার পথে প্রতিবন্ধকতার অভাব নেই। অনেক সময় ওপরে উঠতে গেলে আরও নিচে নেমে যেতে হয়। যেমন—আমাদের এখানে এখনো ডিজাইনারদের শোয়ের জন্য কোনো স্পনসরশিপ পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। বাংলাদেশি বলে বহির্বিশ্বে গুরুত্বটা সেভাবে পাওয়া যায় না এখনো। দেশের ফ্যাশন এবং ফ্যাশন ডিজাইনারদের নিয়ে বাংলাদেশ সরকারেরও কোনো পরিকল্পনা বা সহযোগিতা করার মানসিকতা এখনো হয়নি। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় একটি অসুবিধায় পড়তে হয় ফ্যাশন নিয়ে কোনো রিসার্চ করতে গেলে। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে তো সহযোগিতা পাওয়াই যায় না, সরকার থেকেও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় না এ ক্ষেত্রে। দেখা গেছে অনেক আন্তর্জাতিক প্রোজেক্ট আমি করতে পারিনি শুধু স্পনসরশিপ না পাওয়ায়। কিন্তু এগুলো করতে পারলে শুধু আমার জন্য না, দেশের জন্যও ফলপ্রসূ হতো।

দেশের ফ্যাশনে একটি বড় হুমকি চারদিকে এত ফ্যাশন ডিজাইনার হয়ে যাওয়া। এতে পোশাকের গুণগত মান থেকে শুরু করে যাবতীয় সবকিছু নষ্ট হচ্ছে। নকল হচ্ছে প্রচুর ডিজাইন। এর কিছু কারণও রয়েছে। প্রথমত, না বুঝেই অনেকে এই পড়াশোনায় ঢুকে গিয়ে শেষমেশ নিজেদের প্রমাণ করতে পারছে না বা প্রমাণ করতে গিয়ে ডিজাইনের মান নষ্ট করছে। অনেক সময় স্নাতক শেষ করেই নিজেকে অনেক বড় ভেবে ফেলে অনেকে। আমি মনে করি বড় হওয়ার শেষ নেই। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ ফ্যাশন উইক লন্ডনে বিবি রাসেল দিদি, রিনা লতিফ আপুর সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে আমিও আমন্ত্রণ পাই। এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া অবশ্যই। কিন্তু তার মানে এই নয়

যে আমি বিবি দির সমতুল্য হয়ে গিয়েছি। তিনি আমার চেয়ে অনেক বিশাল। নতুনদেরও বলব, নিজেকে বড় না ভেবে প্রকৃত বড়দের সম্মান করে চলতে।

ফ্যাশন নিয়ে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আসলে একটু অন্য রকম। আমি সবার আগে প্রাধান্য দিই পরিবেশকে। তাই আমার ব্র্যান্ড ‘আফসানা ফেরদৌসি’তে যত ডিজাইনই করি এবং পোশাক ডেভেলপ করি তা অবশ্যই পরিবেশবান্ধবই করি এবং করব। ভবিষ্যতে ইচ্ছা আছে বাংলাদেশেই

পরিবেশবান্ধব ফ্যাশনকে ব্যাপকভাবে এবং বাণিজ্যিকভাবে নিয়ে আসতে। এবং একই সঙ্গে আমার পোশাকের মধ্যে দেশের সংস্কৃতিকে বহির্বিশ্বে পৌঁছে দিতে। ফ্যাশন নিয়ে কাজ করা মানে আমার কাছে শুধু পোশাক ডিজাইন করা নয়। দেশের হয়ে ফ্যাশন এবং ফ্যাশনের বিদ্যা ও ইতিহাস সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া। ফ্যাশন স্কুল থেকে পাস করেছি কিন্তু একটি সাবজেক্ট ছিল না আমাদের, যেখানে ফ্যাশন ইতিহাস নিয়ে পড়তে পেরেছি। সেই তাগিদে আমি আর আমার এক ছোট ভাই আব্দুল্লাহ আল কেমী মিলে একটি বই লিখছি বাংলাদেশের ফ্যাশন ইতিহাস নিয়ে। দেশের ফ্যাশন ইতিহাস নিয়ে পরিপূর্ণ কোনো বই এখনো নেই। তাই আশা করি আমরা ভালোভাবেই মানুষের কাছে সেটি পৌঁছে দিতে পারব। ফ্যাশন স্কুলগুলো ইউরোপীয় ফ্যাশন শেখানোর আগে নিজের সংস্কৃতিকে আগে শেখাবে। ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে এটা আমার অনেক বড় একটি দায়িত্ব একটি নৈতিক সাপ্লাই চেইন প্রতিষ্ঠিত করা। সেই সঙ্গে শ্রম-মান উন্নত করার পাশাপাশি পৃ থ্বীর আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর একটি পরিবেশ দেওয়া, যেখানে কোনো কাপড়কে রঙিন করতে গিয়ে আমরা আমাদের নদীগুলোকে ধ্বংস করব না, কাপড়ের চাকচিক্য বাড়ানো এবং সঙ্গে দাম কমানোর জন্য কোনো শিশুর হাত ব্যবহার করব না।

আফসানা ফেরদৌসি
তরুণ ফ্যাশন ডিজাইনার